মহানবী(সঃ) এর বাণী

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ মহানবী(সঃ) এর বাণী ।

‘এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন কোনো দেবতার জীবন নয়, বরং একজন মানুষের জীবন । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জীবন পুরোটাই মানুষের ।’ –স্ট্যানলি লেন-পুল

আরবের সুমহান সংস্কারক মুহাম্মদ (সা.) যে প্রথা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা অর্থবহ। এটা এক বিস্ময়কর ঘটনা যে বিশ্বের খ্রিষ্টানদের অন্যতম শক্তি আধুনিক যুগের মুসলমানদেরও সবচেয়ে বড় শক্তি হওয়া উচিত। এটি এমন সহনশীলতার সাক্ষ্য দেয়, যা মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টবাদে অসম্ভব ছিল।

পাশাপাশি এটাও বোঝায় যে বিচক্ষণ বিবেচনায় ইংরেজদের সেই ধর্ম সম্পর্কে জানাবোঝা ভালো, যার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মই হলো খ্রিষ্টবাদের একমাত্র গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী। এর সহজ-সরল মূল ধারণা এবং প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রয়োজন মেটাতে এর অনুশাসনগুলো

জুতসই হওয়ায় এটা বিশেষত আফ্রিকায় দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে, যা রোধ করা বা যার সমকক্ষ হওয়া খ্রিষ্টান মিশনারিদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত তাঁর প্রবর্তিত ধর্মব্যবস্থা বর্ণনার একটি যথাযথ সূচনা হবে। বেশির ভাগ ধর্মবিশ্বাসই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বদের ঘিরে আবর্তিত আর ইসলামের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য। মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক সন্দেহের অবকাশ নেই; তাঁর কর্মবহুল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বিস্তারিত জানা গেছে। এই কর্মজীবন অসাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক আর এই চরিত্রটি মানবজাতির হিসেবে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারকারীদের অন্যতম। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মগ্রহণের সময় গোটা আরব নিমজ্জিত ছিল ধর্মীয় অস্থিরতা ও রাজনৈতিক গোলযোগে। এর পথভ্রষ্ট অধিবাসীরা ছিল ইসমাইল (আ.)-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইব্রাহিম (আ.)-এর উত্তরসূরি, আর তাই ইহুদি জনগোষ্ঠীর স্বজাতির মতো। অথচ তারা প্রধানত মূর্তি, আকাশের তারকারাজি, পাথর ও বিভিন্ন বস্তুর পূজারি ছিল। আরবে অনেকগুলো ইহুদি নিবাস ছিল, যা ৫০০ বছর আগে জেরুজালেম ধ্বংস হওয়ার পর থেকে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের অনেকগুলো উপদল সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেখানকার বিভিন্ন স্থানীয় উপজাতির ওপর। এসব উপদলের মধ্যে ছিল আরিয়ন, সাবেলিয়ান, ইউটিচিয়ান, ম্যারেনাইট, কলিরিডিয়ান। তবে মরুভূমির মুক্ত আবহে আরও অনেক ধর্মীয় খামখেয়ালিপনার বিকাশ হয়েছিল।

সেখানে কিছু লোক হানিফ নামেও পরিচিত হয়েছিল। তারা নিজেদের সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করেনি। তারা ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও তপস্যাকারী দরবেশদের মতো। তারা একেশ্বরবাদের কথা বলত, যা কিনা খ্রিষ্টবাদ ও এসেনবাদের একটি মিশ্রণের মতো ছিল। তুলনামূলকভাবে জীবনের ও মতবাদের এই শুদ্ধতা আরব উপদ্বীপে ধর্মের চরম অবক্ষয় রোধ করেছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের আগে থেকেই অনেকের মধ্যে নৈতিক সংস্কারের দ্রুত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। বস্তুত আরবের বাতাসে তখন এমন একটা প্রত্যাশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে একজন আরব মসিহ নতুন এক ধর্ম নিয়ে আসবেন। বড় ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লব ঘটার ভূমি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সময়মতো সেই মানুষের আগমনও ঘটেছিল ।

মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের আগেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। আর যখন তিনি ছয় বছর বয়সের বালক, তখন তিনি তাঁর মাতা আমিনাকে হারান। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হতে থাকেন। তিনি যদিও মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করেননি, তবু যত দিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর সেরা বন্ধু হয়ে ছিলেন। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) গরিবি হালে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি মেষ-ভেড়ার পাল চরাতেন ও চাচা আবু তালিবকে ব্যবসার কাজে সহায়তা করতেন। ২৫ বছর বয়সে চাচার মাধ্যমে তিনি মক্কার ধনাঢ্য বিধবা খাদিজার উটচালক হিসেবে কাজ পেলেন এবং তাঁর সওদাগরি কাফেলার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়ায় গেলেন। তাঁর সফল ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনায় খুশি ও তাঁর ব্যক্তিগত [চরিত্রের] সৌন্দর্যে [মাহাত্ম্যে] আকৃষ্ট হয়ে খাদিজা নিজের বোনকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, যদিও তিনি বয়সে ছিলেন ১৫ বছরের বড়। দ্রুত তাঁদের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল এবং মুহাম্মদ (সা.) একজন ধনী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। তবে তাঁর নিজের ব্যবসায় তেমন কোনো সাফল্য আসেনি। ধর্ম ও ব্যবসায় অনেক সময়ই বড় ধরনের সন্ধির প্রয়োজন হয় আর মুহাম্মদ (সা.) তখনো এই দুই ক্ষেত্রে সমভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠেননি। জন্মগতভাবে চাপা স্বভাবের এবং কাব্যিক ও স্বপ্নময় অতীন্দ্রবাদে আচ্ছন্ন মনের অধিকারী হওয়ায় তাঁর পার্থিব কাজকর্ম কিছুটা

অবহেলিত হচ্ছিল। ধর্মের প্রতি আন্তরিক টান বেড়ে চলছিল। তিনি বেশির ভাগ সময় মরুভূমি ও আশপাশের পাহাড়ে একাকী ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন। এক অদেখা দ্বন্দ্ব তাঁর চিত্তে ছাপ ফেলেছিল।

৪০ বছর বয়সের সময় মুহাম্মদ (সা.) মক্কার কাছে পাহাড়ের নির্জনতায় তাঁর প্রথম 'ঐশী বাণী' লাভ করেন। এ যুগের ভাষায় ভাবার্থ করলে তার মানে দাঁড়ায় এ রকম, পাপাচার, ঔদাসীন্য ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষকে এসব থেকে তুলে আনার জন্য; ওপর থেকে বজ্রপাতের ন্যায় তাদের কানে এক বার্তা দেওয়ার জন্য; এবং তাদের এক অবিভাজ্য, সর্বশক্তিমান ও সর্বদয়াময় আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আনার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে, যা তিনি প্রথমবার অনুভব করলেন। একটানা রোজা রেখে অন্ধকারময় পাহাড় ও নীরব উপত্যকার গুহায় দিনের পর দিন এক ভাবাবেশপূর্ণ ধ্যানমগ্নতায় ডুবে থাকা ও রাতযাপন তাঁকে এক দৃঢ়বিশ্বাসী স্বপ্নদর্শী করেছিল যে আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির জন্য তাঁর বার্তাবাহক হতে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। এই দৈববাণী (ওহি) পবিত্র কোরআনের ৯৬ নম্বর সুরাকে (সুরা আলাক) নির্দেশ করে। মুহাম্মদ (সা.) শুধু তাঁর আপনজন (স্ত্রী বিবি খাদিজা ও চাচাতো ভাই আলী) ও বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকরকে বিষয়টি জানালেন। তবে বিষয়টি সত্যি কি না, তা নিয়ে সন্দেহের যন্ত্রণায় যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তাঁর এই বন্ধু-স্বজনদের সহানুভূতি সেই যন্ত্রণার উপশম ঘটায়। অবশ্য দীর্ঘ সময় ধরে বার্তা প্রচারের ঐশিত্ব সম্পর্কে নানা সন্দেহ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল, তিনিও খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম ওহি নাজিলের পর ছয় মাস ওহি বন্ধ ছিল। তারপর আবার যখন ওহি নাজিল হলো, তখন থেকে তিনি ইসলাম প্রচারকাজ শুরু করেন। তবে একবার বিশ্বাস যখন তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হলো, তখন তিনি তাতে অনড়-অটল হয়ে রইলেন। তাঁর চাচা তাঁকে যখন অনুরোধ জানালেন তিনি যেন মক্কাবাসীকে ধর্মান্তর প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দেন আর তাহলে নিরন্তর বিপদও (পৌত্তলিক মক্কাবাসীদের তীব্র বিরোধিতা ও নির্যাতন) কেটে যাবে, তখন মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, 'তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে বলে যে তুমি তোমার এই প্রচারকাজ থেকে বিরত হও, তাহলেও আমি এ কাজ থেকে বিরত হব না যতক্ষণ না আমার প্রভু

আমাকে জয়ী করবেন অথবা যদি এ কাজের জন্য আমার মৃত্যুও হয়।' এই বলে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে আমার ভাতিজা, তুমি তোমার ধর্ম প্রচার করো আর শান্তিতে থাকো। আমি কোনো অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করব না।'

বিশ্বাসীদের ছোট দলটি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল। চার বছরে নীরবে ইসলাম প্রচারকালে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪০ জনে, যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষ। এরপরই তিনি প্রকাশ্যে এসে ধর্মপ্রচার ও মক্কাবাসীর মিথ্যা উপাসনা বাতিল ঘোষণা করার যৌক্তিকতা অনুভব করলেন (এ সময় ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহর ওহি নাজিল হয়েছিল)। নতুন কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি শুধু তাদের পূর্বসূরি ইব্রাহিম (আ.)-এর শুদ্ধতর ও সত্যময় বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার ডাক দিয়েছিলেন। কাবাঘরের (এক আল্লাহর) প্রার্থনায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ও তাদের নগরীতে হজের মৌসুমের লাভজনক ব্যবসা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় মক্কাবাসী মুহাম্মদ (সা.)-এর চরম শত্রু হয়ে উঠল, তাঁকে প্রতি মুহূর্তে বিরোধিতা ও বিদ্রূপ করতে লাগল।

তাদের ঘৃণা এতটাই সহিংস হয়ে উঠেছিল যে আবু তালিব তাকে কিছু সময়ের জন্য দেশের কোনো নিরাপদ স্থানে রাখার কথা ভেবেছিলেন। এ রকম সময় তাঁর স্ত্রী বিবি খাদিজা ইন্তেকাল করেন। এর অল্প পরই মারা যান চাচা আবু তালিব। এতে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, তিনি দীনহীন অবস্থায় পতিত হন। তিনি আত্মরক্ষায় দেশের আরেক প্রান্তে (তায়েফ নগরী) গিয়ে বিপদে পতিত হন ও কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন। তবে তাঁর জীবনের মোড় ঘোরানোর মুহূর্তটি তখন আসন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বী নগরী ইয়াসরিব (যা পরবর্তী সময়ে মদিনা নামে পরিচিত হয়) থেকে হজের মৌসুমে আগত পুণ্যার্থীদের একটি দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং

তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছরগুলোয় ইয়াসরিব থেকে তাঁদের সংখ্যা এত বাড়তে থাকে যে মুহাম্মদ (সা.) তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী করেন। আর যখন তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত হয়, তখন এক রাতে তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করেন ও বন্ধুপ্রতিম নগরীটিতে শরণার্থী হিসেবে গমন করেন (এ ঘটনা হিজরত বা অভিবাসন হিসেবে পরিচিত)। তখন থেকেই মুসলমানদের দিনপঞ্জি বা হিজরি সাল গণনা শুরু হয়।

মুহাম্মদ (সা.) এখন মুক্তভাবে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে লাগল। একদা অবহেলিত ধর্মগুরু এখন এক নগর ও দুই শক্তিশালী গোষ্ঠীর শাসক। আরবের বিভিন্ন স্থানের ইসলামের প্রচারকদের পাঠানো হলো, এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিসর ও পারস্য বাদ গেল না। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর শত্রুবেষ্টিত পবিত্র নগরীতে শান্তিপূর্ণভাবে হজ পালন করলেন । আর [হিজরতের আট বছর পর] মক্কার ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়, বসবাসরত সব গোত্রের লোকজন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেয় আর গোটা আরব ভূমির ওপর মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। পরাজিতরা বিজয়ীর অসাধারণ মহানুভবতায় বিস্মিত হয়। শুধু তিন-চারজন দুর্বৃত্তকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো আর সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো।

প্রচণ্ড পরিশ্রম, নিরন্তর ব্যস্ততা, শিশুসন্তান ইব্রাহিমের মৃত্যুতে শোকাঘাত এবং খায়বারের ইহুদিনীর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া বিষ থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণা—এ সবকিছু মিলে তাঁর শরীরকে দুর্বল করে দিতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। যতক্ষণ শারীরিক সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ তিনি তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে কথা বললেন, তাঁদের ধর্মনিষ্ঠার পথে থেকে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার ও ভালো কাজ করার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে প্রত্যেক মানুষকে আখিরাতে নাজাতের জন্য নিজেকেই কাজ করতে হবে। তিনি কোরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন, কারও সঙ্গে কোনো ভুল বা অন্যায় করে থাকলে সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন, উত্তরসূরি নিয়োগ করলেন ও ক্রন্দনরত অনুসারীদের নিজের ইন্তেকালের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত

করলেন। স্ত্রীর কোলের বালিশে রাখা মাথা আর ঠোঁটে ক্ষমা ও বেহেশতের প্রার্থনা নিয়ে এক মহাত্মার মৃত্যুযন্ত্রণা শেষ হলো আর ইসলামের প্রচারক তাঁর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর লোকজন ভীষণ বেদনাহত হয়ে পড়ল। অর্ধোন্মত্ত উমর তাঁর তরবারি বের করে উপস্থিত ভিড়ের দিকে তেড়ে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, যে বলবে আল্লাহর নবী আর নেই, তারই মাথা কাটা পড়বে। আবু বকর তাঁকে শান্ত করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণের বাণী শোনালেন। মাঝারি উচ্চতা, চওড়া কাঁধ, দৃঢ় গঠন, নিখুঁত অবয়ব, ঘন-কালো চুল, চোখ ও লম্বা দাড়ি নিয়ে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মনোরম অস্তিত্বময় এক পুরুষ। তাঁর মানসিক শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল সংযত অথচ অমায়িক ও বিনয়াবনত। তাঁর বাচন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং প্রায়ই সরস। প্রচণ্ড আবেগি অথচ মহৎ প্রেরণাদায়ী, ভালোবাসায় অনন্য ও অত্যন্ত উদারচিত্তের অধিকারী মানুষটির চরিত্রে ছিল বিস্ময়কর শক্তি, সামর্থ্য, কূটবুদ্ধি ও একাগ্রতার এক মিশ্রণ। যৌবনে মিতাচারী ও বিচক্ষণ তিনি 'আল-আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধি পেয়েছিলেন পূর্ণবয়স্ক হতে না-হতেই, আর তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ন্যায্য ও ন্যায়পরায়ণ লেনদেনের জন্য। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একাধারে পক্ষপাতশূন্য ও স্নেহশীল। এক জীর্ণ কুটিরে দীনহীনভাবে থাকতেন, খেতেন খুব সাধারণ খাবার, নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালাতেন, নিজের জামা-জুতো নিজ হাতে সেলাই-সারাই করতেন আর নিজ দাসদের স্বাধীনতা দিয়ে দিতেন। মাসের পর মাস তিনি ভালো খাবার নিজে না খেয়ে অভাবীদের মধ্যে তা ভাগ করে দিতেন; প্রচুর গরিব মানুষ তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যে জীবন ধারণ করত।

নিচের সুন্দর ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

একদিন মুহাম্মদ (সা.) তালগাছের নিচে ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলেন দুতার নামে তাঁর এক শত্রু তাঁর

সামনে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হে মুহাম্মদ। তোমাকে এবার এখানে কে রক্ষা করবে?' 'আল্লাহ', মুহাম্মদ (সা.) জবাব দিলেন। এ কথা শুনে তাঁর হাত থেকে তলোয়ার মাটিতে পড়ে যায়। এবার মুহাম্মদ (সা.) তলোয়ার তুলে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হে দুতার, এবার তোমাকে এখানে কে রক্ষা করবে?' 'কেউ না', দুতার জবাব দিল। 'তাহলে আমার কাছ থেকে দয়াবান হতে শেখো', বলে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অস্ত্র তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দুতার পরবর্তীকালে তাঁর অন্যতম সাহাবা হয়েছিলেন। (গ্রাহামের 'এথিকস অব দ্য গ্রেট রিলিজিয়নস' থেকে সংক্ষেপিত।)

সূত্র: স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, অনুবাদ: আসজাদুল কিবরিয়া, মহানবীর (সা.) বাণী,

পৃষ্ঠা: ৩১–৩৬, প্রথমা

প্রকাশন, ঢাকা।

.....